অর্থ পাচারের অভিযোগেও বিতর্কে ইউনূস সরকার

ছবি: সংগৃহীত

সময় যত এগোচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার পরিধিও তত বাড়ছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন এই সময়কালকে ঘিরে অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনসহ নানা খাতে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে অর্থ পাচারের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত বৃদ্ধির তথ্য প্রকাশের পর।

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের জমা অর্থ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ সুইস ফ্রাঁ। এক বছর আগে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৯ কোটি সুইস ফ্রাঁ। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আমানত বেড়েছে প্রায় ৪১ শতাংশ।

বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী, এই অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকার সমান। ২০২১ সালের পর এটিই বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ আমানতের রেকর্ডগুলোর একটি। দুই বছর ধারাবাহিক পতনের পর ২০২৪ সালে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছিল, ২০২৫ সালে তা আরও জোরালো হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সুইস ব্যাংকে আমানতের দিক থেকে প্রথম অবস্থানে রয়েছে ভারত। তবে তাদের আমানত আগের বছরের তুলনায় কমেছে। বিপরীতে বাংলাদেশের আমানত উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

তবে সুইস ব্যাংকই অর্থ পাচারের একমাত্র গন্তব্য নয়। বিভিন্ন গবেষণা ও আন্তর্জাতিক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের বড় অংশ যায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কেম্যান আইল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশে। ফলে সুইস ব্যাংকের হিসাব কেবল বৃহত্তর চিত্রের একটি অংশমাত্র।

অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ও অর্থ পাচারের অভিযোগ ছিল ব্যাপক। সে সময়ের অর্থ পাচার নিয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি কাজ করেছে এবং বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থপ্রবাহের তথ্য সামনে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও অর্থ পাচার রোধে দৃশ্যমান সাফল্য পাওয়া যায়নি।

ড. ইউনূস ক্ষমতা গ্রহণের পর অর্থ পাচার বন্ধ এবং বিদেশে থাকা অর্থ ফেরত আনার অঙ্গীকার করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও একই ধরনের আশাবাদী বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা ও নীতিনির্ধারকের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ বিভিন্ন মহলে আলোচিত হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অভিযোগের রাজনৈতিক ব্যবহার নয়, বরং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অনুসন্ধানই হতে পারে গ্রহণযোগ্য পথ।

অর্থ পাচারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার বানালে প্রকৃত অপরাধীরা আড়ালে থেকে যাওয়ার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অর্থ পাচারবিরোধী কার্যক্রম হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত।

জনগণের প্রত্যাশা, অতীত ও বর্তমান—সব সময়ের অর্থ পাচারের ঘটনা সমান গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হবে। যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, দলীয় পরিচয় নয়, অপরাধই হবে বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। কারণ অর্থ পাচার রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে দুর্বল করে, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের সাধারণ মানুষ।

মনে রাখতে হবে, অর্থ পাচারকারী ও দুর্নীতিবাজদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। তাদের একমাত্র পরিচয়—তারা রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান করে।

অদিতি করিম, লেখক ও নাট্যকার

ইমেইল : auditekarim@gmail.com

সূত্র: কালের কণ্ঠ